স্মরণীয় যাঁরা

নূতন সিলেবাস অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের **তৃতীয়** ও **চতুর্থ শ্রেণীর** জন্য অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক।

স্মরণীয় যাঁরা

ux.4

722
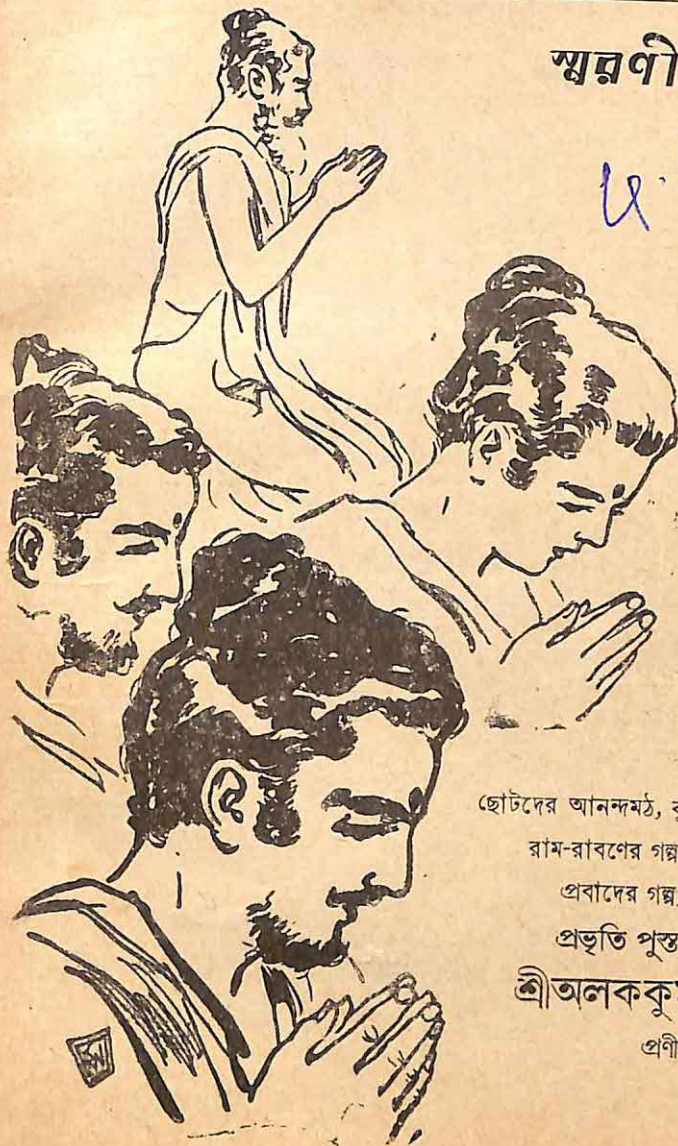
ছোটদের আনন্দমঠ, কুরুপাণ্ডবের কাহিনী, রাম-রাবণের গল্প, গল্পে উপদেশ, প্রবাদের গল্প, অরুণোদয় প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা

শ্রীঅলককুমার ঘোষ

প্রণীত

সূচীপত্র

পাদপূরণের সূচী

স্মরণীয় যাঁরা

—ঃ * ঃ—

মানুষ নহেন, দেবতা

ছেলের পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া মা অবাক্ হইয়া গেলেন। দেখিলেন সারি সারি পিপীলিকা বইয়ের আলমারির দিকে চলিয়াছে।

কি ব্যাপার! খুঁজিয়া দেখেন, বইয়ের পিছনে ছু'খানি রুটি পড়িয়া আছে।

স্কুল হইতে ছেলে ফিরিয়া আসিল। মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোকা, তোর বইয়ের পিছনে রুটি এল কোত্থেকে?"

এই প্রশ্নে ছেলে ভারী লজ্জায় পড়িল। বার বার জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "মা, আমার খাবার রুটি থেকে দু'খানা রুটি রোজ সামনের রাস্তার ভিখারী বুড়ীকে দিই। বুড়ী কাল আসে নি, তাই তার রুটি দু'খানা এই আলমারিতে রেখে দিয়েছিলাম।"

মা তখন ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

এই ছেলেটি কে জান! ইনিই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

অল্প বয়স হইতেই গরীবের দুঃখে সুভাষচন্দ্রের কষ্ট হইত। বড় হইয়া তিনি দেখিলেন, সারা ভারতের বেশির ভাগ লোক উপবাসী থাকে। বহু লোকের পরনে কাপড় জোটে না। টাকার অভাবে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখিতে পারে না। অথচ এই ভারতের পয়সায় বিদেশী ইংরেজেরা কত সুখে দিন কাটায়।

তখন তিনি স্থির করিলেন, বিদেশীদের দূর করিয়া দিয়া দেশকে স্বাধীন করিবেন। ভারতবাসীর যাহাতে অন্ন-বস্ত্রের অভাব না হয়, সেই ব্যবস্থা করিবেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য, তিনি বিদেশীদের দেওয়া ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া দেশসেবায় ব্রতী হইলেন। ইংরেজদের সহিত লড়িয়া সারা জীবনটা কাটাইয়া দিলেন। তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য ইংরেজ সরকার বহুবার তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছে।

যখন তিনি দেখিলেন দেশে থাকিলে ইংরেজ তাঁহাকে

চিরকাল বন্দী করিয়া রাখিবে, তখন দেশের বাহিরে গিয়া তিনি ভারতীয়দের লইয়া এক সৈন্যবাহিনী গঠন করিলেন। ভারত হইতে ইংরেজদের তাড়াইবার জন্য সেই সৈন্যবাহিনী ভারতের দিকে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহাকে একবার জাপানের দিকে যাইতে হয়। পথে তাঁহার এরোপ্লেন ভাঙ্গিয়া পড়ে। তারপর আর তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

নেতাজীর মত লোকেরা মানুষ নহেন, দেবতা। প্রয়োজনের সময় তাঁহাদের আবির্ভাব হয়। আর প্রয়োজন না থাকিলে তাঁহারা অন্তর্ধান করেন।

হয়তো তখন কাজ ফুরাইয়া গিয়াছিল বলিয়াই নেতাজী অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। কারণ তাহার কিছুকাল পরেই ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিয়া স্বাধীন হয়।

● অমর-বাণী

ভয় জয় করার উপায় শক্তি-সাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপ-বিশেষ। শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে মানুষ শক্তি লাভ করিতে পারে।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

মাতৃভক্ত

এখানে যাঁহার কথা বলা হইতেছে তিনি ছিলেন কলিকাতার উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি। ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সেই সময় বিলাতে এক সভা হয়। সেই সভায় পৃথিবীর নানা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা আসিয়া যোগদান করেন। লর্ড কার্জন তাঁহাকে সেই সভায় পাঠাইবেন বলিয়া স্থির করেন ও তাঁহাকে ডাকিয়া সেই সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করেন।

তিনি বলিলেন, "আগে মার অনুমতি চাই। তিনি যদি আপত্তি না করেন, তবে আমার কোন আপত্তি নেই।"

সেই কথা শুনিয়া লর্ড কার্জন বলিলেন, "আপনার মাকে জানাবেন, এটা লর্ড কার্জনের আদেশ।"

তখন ইংরেজেরা ছিল এদেশের শাসনকর্তা। তাহারা ভারতীয়দের তুচ্ছ জ্ঞান করিত। ইংরেজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবার সাহস খুব কম লোকেরই ছিল।

কিন্তু তিনি ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ! তাই তিনি বলিলেন, "আমার মা আপনার হুকুম শুনে কি আদেশ দেবেন জানেন? তিনি বলবেন, আমার ছেলেকে আদেশ দেবার কি অধিকার আছে লর্ড কার্জনের?"

তাঁহার মাতৃভক্তি ও তেজস্বিতা দেখিয়া লর্ড কার্জন আর তাঁহাকে বিলাত যাইতে অনুরোধ করিলেন না।

এই মাতৃভক্ত তেজস্বী পুরুষের নাম স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

স্যার আশুতোষ শুধু তেজস্বীই ছিলেন না, তাঁহার মত বিদ্বান্ তখনকার দিনে খুব কমই ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি সারা জীবন খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন। আজ বাংলাদেশে শিক্ষার যেটুকু বিস্তার হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টার ফল।

আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় কোন কিছু পড়ানো হইত না। স্যার আশুতোষের চেষ্টায় বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের উপর তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু যে আলোর শিখা তিনি আমাদের মধ্যে জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছেন, দিনে দিনে তাহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া চলিয়াছে।

———

নূতন ছন্দের স্রষ্টা

একদিন তিন চারজন বন্ধুর মধ্যে গল্প হইতেছিল। একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখা যায় না।"

এক বন্ধু বাংলা ভাষার চর্চা করিতেন না। তবুও তিনি সেই বন্ধুর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "তোমার ধারণা ভুল। যার ক্ষমতা আছে, সে-ই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখতে পারে।"

বন্ধু ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "তুমি পার ?"

খুব জোরের সঙ্গে সেই বন্ধু উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই !"

যে লোক ভাল বাংলা জানে না সে লিখিবে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা! বন্ধুরা ভাবিলেন, তিনি বোধহয় তাঁহাদের সঙ্গে রহস্য করিতেছেন।

তিনি বাড়ি আসিয়া নিজের টেবিলের ধারে বসিলেন। আর অনর্গল কবিতা লিখিয়া যাইতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে বন্ধুরা কয়জন আবার মিলিত হইলেন। হঠাৎ পকেট হইতে একটি কাগজ বাহির করিয়া সেই বন্ধু পড়িতে সুরু করিলেন। সেটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা কবিতা।

বন্ধুরা তন্ময় হইয়া কবিতা শুনিতে লাগিলেন। কবিতা পড়া শেষ হইল। তবু তাঁহাদের তন্ময়তা ভাঙ্গিল না। এত

অনর্গল কবিতা লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। [পৃষ্ঠা—১০

সুন্দর কবিতা যে বাংলা ভাষায় লেখা যায় তাহা তাঁহারা জানিতেন না। আজ সকলে বুঝিলেন তাঁহাদের বন্ধু সাধারণ মানুষ নন। স্বয়ং সরস্বতী সহায় না হইলে এমন কবিতা লেখা যায় না।

এই বন্ধু আমাদের মধুসূদন।

তোমরা আজকাল কত রকম বই পড়িতে পাও। কিন্তু এক সময়ে বাংলা ভাষায় বেশী বই ছিল না। তখন লোকে সংস্কৃত ভাষা বা ইংরেজী ভাষায় লেখাপড়া শিখিত। ইংরেজ ছিল তখন ভারতের রাজা, তাই রাজার ভাষাই লোকেদের বেশী শিখিতে হইত।

মাইকেল মধুসূদন সেই সময়ে কলিকাতা হিন্দু কলেজে পড়িতেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার খুব দখল ছিল। তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখিতেন। অনেক ইংরেজও তাঁহার মত ইংরেজী লিখিতে বা বলিতে পারিত না।

মধুসূদন পরে বাংলা ভাষার চর্চা করিয়া বাংলা ভাষায় বহু উৎকৃষ্ট কাব্য লেখেন। তাঁহার লেখা মেঘনাদবধ কাব্য আজও বি. এ. ক্লাসে পড়ানো হয়। তাঁহার লেখা ছন্দ বাংলা ভাষার একটি বদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়াছে।

মধুসূদনের শেষজীবন বড় কষ্টের মধ্য দিয়া কাটে। অর্থাভাবে অনেক সময় তাঁহার খাওয়া হইত না। তাই মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে পৃথিবীর সব কষ্ট হইতে মুক্তি দেয়।

তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দিয়া গিয়াছেন তাঁহার কীর্তি —অমর ও অবিনশ্বর অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

নবযুগের স্রষ্টা

আগেকার দিনে আমাদের দেশে সতীদাহ প্রথা বর্তমান ছিল। এই প্রথা-অনুযায়ী মৃত স্বামীর সঙ্গে তাহার জীবিত স্ত্রীকেও দাহ করা হইত।

একদিন এক শ্মশানে সতীদাহ হইতেছিল। জ্বলন্ত চিতার উপর মৃত স্বামীর মাথা কোলে লইয়া তাহার জীবিতা স্ত্রী বসিয়াছিল।

ধীরে ধীরে জীবিত মৃত দুইজনেরই দেহ পুড়িয়া গেল।

চিতাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল বহু দর্শক। তাহার মধ্যে ছিল অল্পবয়সী এক বালক। চিতা নিবিয়া যাইবার পর দর্শকেরা সেই জীবিত দগ্ধ নারীর জয়গান করিয়া উঠিল। কণ্ঠ নীরব রহিল শুধু সেই বালকের। সেই জয়গান হিংস্র পশুর উল্লাসের মত তাহার কানে বাজিতে লাগিল। তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, এই প্রথা বর্বর, বীভৎস ও অন্যায়। এই প্রথা দূর হওয়া অবশ্য প্রয়োজন।

পরে সেই বালকই একদিন বিখ্যাত সমাজসংস্কারক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার নাম রাজা রামমোহন রায়।

হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম হয়। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি ফার্সী, আর্বী, সংস্কৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। সেই সময় তিনি বেদ ও উপনিষদ্ পাঠ করেন।

রামমোহনের তিব্বত যাত্রা

তারপর তিনি যান তিব্বতে। সেখানে অনেক দিন থাকিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। ভারতে ফিরিয়াই তিনি শুরু করেন সমাজ-সংস্কার।

প্রথমে তিনি আঘাত করিলেন সতীদাহ প্রথার উপর। দেশের গোঁড়া পণ্ডিতেরা রামমোহনের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রামমোহনের অকাট্য যুক্তির কাছে তাঁহারা কেহই দাঁড়াইতে পারিলেন না। তখন সরকার আইন করিয়া সতীদাহ বন্ধ করিয়া দিলেন।

জাতিভেদ ও উচ্চ বর্ণের লোকেদের অত্যাচারে তখন বহু লোক হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইতেছিল। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া রামমোহন হিন্দুদের বাঁচাইলেন। দলে দলে হিন্দুর খ্রীষ্টান-হওয়া বন্ধ হইল।

তারপর স্ত্রী-শিক্ষা। মেয়েরা লেখাপড়া শিখিবে, তখন তাহা ছিল সকলের কল্পনার বাহিরে। রামমোহনের চেষ্টায় ও যত্নে প্রথম মেয়েদের স্কুল খোলা হইল।

রামমোহন ছিলেন একজন নিরলস কর্মী।

সারা জীবন ধরিয়া তিনি সমাজের কল্যাণের জন্য বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কত ভাল কাজ যে তিনি করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কুসংস্কারের পাহাড় আমাদের উন্নতির পথে বিরাট বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রামমোহন সেই বাধাসমূহ দূর করিয়া আমাদের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দেশ ও জাতির জীবনে নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন। তাই তিনি প্রাতঃস্মরণীয়।

নমস্য পণ্ডিত

ভারত স্বাধীন হইবার কিছুকাল পূর্বেও বাঙ্গালীরা ইংরেজকে বেশ ভয় করিত। কারণ, সামান্য সুযোগ পাইলেই তখন ইংরেজরা দেশীয় লোকদের অপমান করিত। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে সত্তর বা আশী বছর পূর্বে ইংরেজের কিরূপ আধিপত্য ছিল।

সেই সময় এক সাহেবের কাছে এক বাঙ্গালী কোন প্রয়োজনে আসিয়াছিলেন। সাহেব তখন জুতা-পরা পা দুইটি টেবিলের উপর রাখিয়া চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়া বসিয়া ছিল। কোন লোকের সামনে এইভাবে পা তুলিয়া বসিয়া থাকা অভদ্রতা। সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটিকে দেখিয়াও সাহেব পা নামাইল না। ইহাতে সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কোন কাজের দরকারে সাহেবকে সেই ব্যক্তির কাছে আসিতে হয়। সেই ব্যক্তি চটি জুতা পরিতেন। সাহেব দেখেন, ধুলামাখা চটি জুতা পরা পা দু'টি

তিনি টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন।

সাহেবের অত্যন্ত রাগ হইল। কিন্তু সেই ব্যক্তি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।
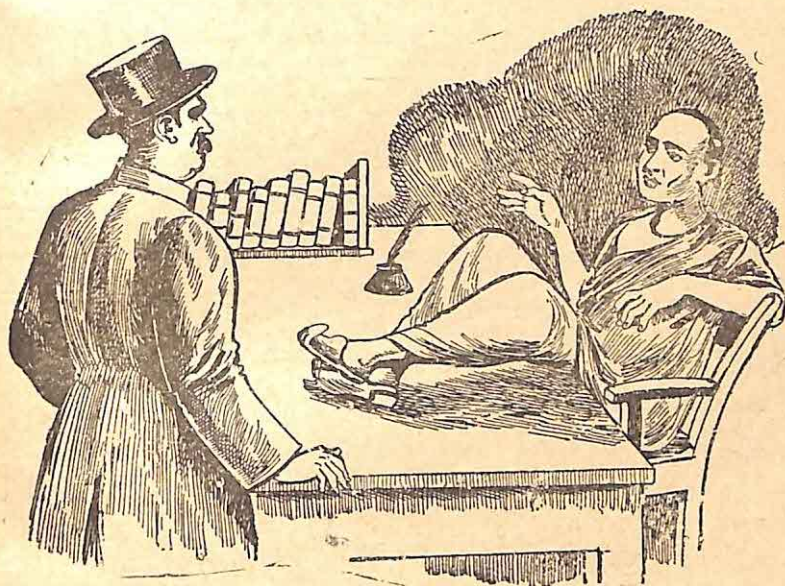
টেবিলে পা তুলিয়া বসিয়া আছেন

সেই তেজস্বী ব্যক্তি হইলেন, বাঙ্গালীর নমস্য পণ্ডিত ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র খুব মেধাবী ছিলেন। তাঁহার মাতৃভক্তির

তুলনা ছিল না। তিনি খুব দয়ালু ছিলেন। কেহ কোন প্রার্থনা করিলে, তিনি সাধ্যমত তাহার অভাব মিটাইতেন।

তোমরা বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়া শিক্ষা আরম্ভ কর। বর্ণপরিচয় তাঁহারই লেখা।

পূর্বে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কথা বেশী থাকিত। সেইজন্য বাংলা ভাষা সাধারণে বুঝিতে পারিত না।

বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষাকে সরল করিয়া দিলেন। তাহার পর হইতে বাংলা ভাষার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। এই কারণে তাঁহাকে বাংলা ভাষার জনক বলা হয়।

তিনি দেশের জন্য বহু ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন।

আজ তিনি নাই, কিন্তু তাঁহার কীর্তি প্রতিমুহূর্তে আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার বই পড়ে নাই এমন বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রী কেহ নাই। তাঁহার মত মহাপুরুষ আমাদের দেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

———

বিশ্বের কবি

ছোট্ট একটি ছেলে দালানে চটি পায়ে দিয়া ঘোরাঘুরি করিতেছে। চটি মুহূর্তমাত্র পায়ের স্পর্শে আসিয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িতেছে। ফলে পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা হইতেছে বেশী।
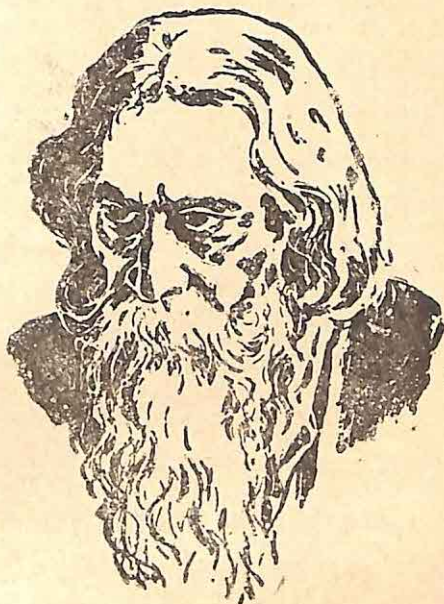
ছেলেটি চঞ্চল। এমনিভাবে ছুটাছুটি করিয়াই তাহার দিন কাটে। তাহাকে শান্ত করিয়া রাখিবার জন্য বাড়ির চাকর তাহার চারিদিকে একটি গণ্ডি করিয়া দিত। সে ছেলেটিকে বলিত, সাবধান, গণ্ডির বাহিরে আসিও না! আসিলে···বাকীটুকু চাকর আর বলিত না।

তখনই ছেলেটির মনে পড়িয়া যাইত রামায়ণের সীতাহরণের গল্প। অজানা ভয়ে সে গণ্ডির মধ্যে শান্ত হইয়া বসিয়া থাকিত।

তখন কি কেহ জানিত যে এই ছেলেটিই একদিন সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি হইয়া উঠিবেন।

তিনিই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধনীর ঘরে তাঁহার জন্ম, কিন্তু ধনীর ছেলের মত বিলাসে তিনি মানুষ হন নাই।

একটু বড় হইয়া তিনি বর্ণপরিচয় পড়া শুরু করিলেন। বর্ণপরিচয়ের এক জায়গায় আছে, জল পড়ে,—পাতা নড়ে। বর্ণপরিচয়ের এই কথাগুলি পড়িয়া তাঁহার মনে হইত সত্যই জল পড়িতেছে আর সেইজন্য পাতাগুলি নড়িতেছে। তাঁহার মন তখন উদাস হইয়া যাইত।

যখন তাঁহার মাত্র আট বছর বয়স তখন হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন।

তিনি ছেলেবয়স হইতে গানও লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার স্বর খুব মধুর ছিল। তিনি একবার নিজের লেখা একটি গান গাহিলে তাঁহার পিতা খুব খুশী হন এবং তাঁহাকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেন।

সারা জীবন ধরিয়া অজস্র কবিতা তিনি লিখিয়াছেন। সারা বিশ্বের বহু ভাষায় সেই সকল কবিতার অনুবাদ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার বহু উন্নতি করিয়াছেন। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বর্তমানে বাংলা ভাষার মত উন্নত ভাষা আর নাই। ইহার অন্যতম কারণ রবীন্দ্রনাথের রচনা বাংলা ভাষার মধ্যে দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতের প্রধান জাতীয় সংগীত—'জনগণ মন অধিনায়ক' রবীন্দ্রনাথের রচনা।

ভারতবাসীকে পূর্বে অন্যান্য দেশ অবজ্ঞা করিত। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়া জগতের সকলকে দেখাইয়া দিলেন, ভারতবাসী অবজ্ঞার পাত্র নয়।

পিতা রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কার দিতেছেন। [পৃঃ—২০

রবীন্দ্রনাথ কেবল বাঙ্গালীর নহেন, তিনি সারা ভারতের। ভারতের সম্মান রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ চিরস্মরণীয়।

● **মণিমুক্তা**

কাঁটাবনের গোলাপটাই সতিকারের গোলাপ।

—রবীন্দ্রনাথ

Acc no- 14717

বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের ঋষি

পাঠশালা বসিয়াছে। গুরুমহাশয় পড়াইতেছেন; ছাত্রেরা মন দিয়া পড়িতেছে। পড়াইতে পড়াইতে গুরুমহাশয় লক্ষ্য করিলেন, একটি ছাত্রকে যাহা কিছু শিখানো যায়, সে তাহা চটপট শিখিয়া ফেলে। তিনি তাহার বুদ্ধি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন।

একবার গুরুমহাশয় তাহাকে বলিলেন, "বাপু, এত চটপট সব শিখে ফেললে, আমি আর কতদিন তোমার গুরুগিরি করতে পারব।"

এই ছেলেটিই আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র।

চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। প্রথম দিন পাঠশালায় গিয়া মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র বাংলা অঙ্ক আয়ত্ত করিয়া তিনি সকলকে অবাক্ করিয়া দেন।

ছাত্রজীবনে তিনি জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এই সময়েই তিনি একটি প্রতিযোগিতায় কবিতা প্রেরণ করেন এবং তাহাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্বপ্রথম বি. এ.
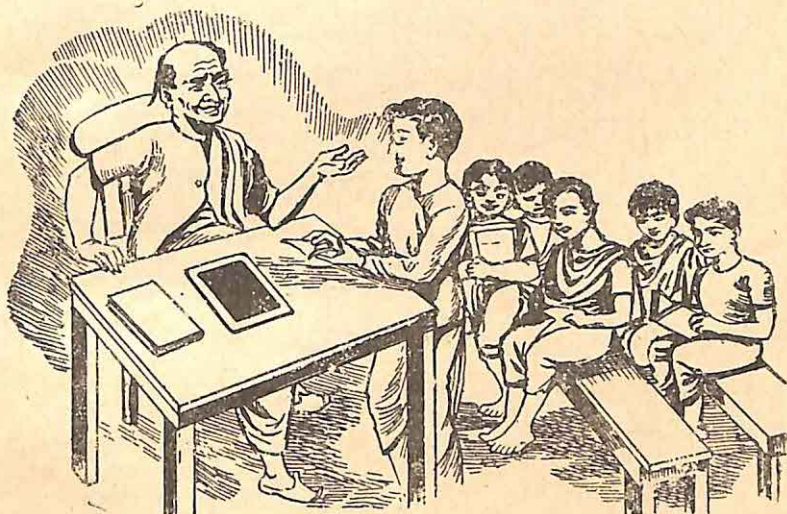
"আর কতদিন তোমার গুরুগিরি করতে পারব!" [পৃঃ—২২

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপরে সাফল্যের সঙ্গে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সরকারের অধীনে চাকুরি করিলেও সব সময় নিজের মানসম্ভ্রম বাঁচাইয়া চলিতেন। ইহার ফলে কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার প্রায়ই মনোমালিন্য ঘটিত।

চাকুরি করিবার সময়েই তিনি সাহিত্য-চর্চা করিতেন। তিনিই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সরল ভাষাকে মধুর করিয়া তোলেন। ফলে বাংলা ভাষা আরও শক্তিশালী হইয়া ওঠে। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্য-সম্রাট্ বলা হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত সব উপন্যাস আজও সমাদৃত। 'দুর্গেশ-নন্দিনী' তাঁহার প্রথম উপন্যাস।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক। দেশকে স্বাধীন করিবার মূলমন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' বঙ্কিমচন্দ্রই দান করেন। আজ স্বাধীন ভারতে উহা অন্যতম জাতীয় সংগীতরূপে গণ্য হইয়াছে। তাঁহাকে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বলা হয়।

তাঁহার রচিত আনন্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি উপন্যাস দেশকে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়াছে।

———

তরুণ সন্ন্যাসীর দিগ্বিজয়

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। সেই দেশের এক শহরের নাম শিকাগো। সেখানে এক ধর্ম-সভা আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে অনেক লোক সেই সভায় যোগ দিতে আসিয়াছেন। সকলে নিজ নিজ ধর্মের বিষয় আলোচনা করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন পৃথিবী-বিখ্যাত দার্শনিক।

সভা শুরু হইল। সেখানে এতটুকু জায়গা খালি পড়িয়া নাই। একজনের পর একজন বক্তা তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যান। শ্রোতাদের আবেদন করিয়া বলেন,—সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! তিনি এবং শ্রোতারা সকলে যে পৃথক্ তাঁহাদের আবেদন করিবার ভাষাতেই বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের বক্তৃতা শেষ হয়, শ্রোতারা মৃদু করতালি দিয়া অভিনন্দন জানান।

সেই সভায় এক অন্ধকার কোণে অলক্ষিতে দাঁড়াইয়া ছিলেন এক যুবক। সভায় সমস্ত পুরুষের সাহেবী পোশাক। কিন্তু তাঁহার গেরুয়া বসন। ক্রমে তাঁহার বলিবার সময় আসিল। কম্পিত পদে তিনি মঞ্চে আসিয়া উঠিলেন।

ধর্মসভায় বক্তৃতা

গেরুয়া পাগড়ি মাথায় গেরুয়া বসন পরা এই যুবক, যাহার ভাল করিয়া গোঁফদাড়ি উঠে নাই, সে কি বক্তৃতা করিবে? সকলের মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেল।

কিন্তু যুবক যখন 'সমবেত ভ্রাতা ও ভগিনীবৃন্দ!' বলিয়া

তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন সকলে মুগ্ধ হইয়া ঘনঘন করতালি দ্বারা তাঁহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ অবধি আর সে করতালি থামে না। একটি কথায় তিনি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের লোককে আপনার করিয়া লইলেন।

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ

সেই বক্তৃতার শুরুতে তিনি যে অভিনন্দন পাইলেন, আজ অবধি কাহারও ভাগ্যে জুটিয়াছে কিনা তাহা সন্দেহ! অন্ধকার ঘর যেমন একটি কাঠির আলোয় মুহূর্তে আলোকিত হইয়া ওঠে, একটি কথায় তিনি পৃথিবীখ্যাত হইয়া উঠিলেন। তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলে একেবারে মোহিত হইয়া গেল। এক গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী দিগ্বিজয় করিয়া নিজ দেশে ফিরিলেন। তিনিই আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ।

বাল্যে তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ছেলেবেলা হইতে

তিনি ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। যৌবনের আরম্ভে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে আসেন। রামকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বরের অবতার। তিনিই বিবেকানন্দকে ধর্মজ্ঞান দিয়াছিলেন।

এই ধর্মজ্ঞান যাহাতে সারা ভারতে ও পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন। বিবেকানন্দ গুরুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

শংকরাচার্য আসমুদ্র-হিমাচল ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, আর বিবেকানন্দ করিলেন আমেরু-পশ্চিমাঞ্চল। আর সেই সঙ্গে প্রচার করিলেন সেবাধর্ম।

অতি অল্প বয়সে, মাত্র ঊনচল্লিশ বৎসর বয়সে বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করেন। কিন্তু সেই অল্প কালের মধ্যে তিনি জগৎকে জানাইয়া গেলেন, কোন ধর্মের চেয়ে হিন্দুধর্ম হীন নয়; বরং শ্রেষ্ঠ।

সেইজন্য দেশ-বিদেশের বহু লোক রামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য হইয়াছেন। বিবেকানন্দের শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে ভারতের আর একটি উজ্জ্বল দীপ নিবিয়া গিয়াছে।

● সুদূরের বাণী

চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

জ্ঞানের পূজারী

প্রায় নব্বই বছর আগেকার কথা। এখনকার মত তখন যেখানে সেখানে স্কুল ছিল না, ছিল বাংলা পাঠশালা। সেখানে বাংলা ভাষায় লেখাপড়া শেখানো হইত।

সেই রকম এক বাংলা পাঠশালায় একটি বালক শিক্ষালাভ করিত। সে যেখানে বসিত, তাহার ডানদিকে বসিত তাহার পিতার মুসলমান চাপরাসীর ছেলে, আর বামদিকে বসিত এক জেলের ছেলে। এই দুই সহপাঠীর তুলনায় ছেলেটির অবস্থা এবং সামাজিক মর্যাদা ছিল অনেক উঁচু, তবু তাহাদের মধ্যে ছিল আন্তরিক বন্ধুত্ব।

সেই বন্ধু দুইজনের নিকট হইতে বালকটি গাছপালার কথা শুনিত।

ছেলেবেলায় শোনা গাছপালার নানা কথা সেই ছেলেটির মনে ছিল। বড় হইয়া তিনি একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী হইয়া উঠিলেন। সারা জগতের সামনে প্রমাণ করিলেন, গাছেরও প্রাণ আছে। বিলাতের নানা সভায় বক্তৃতা করিয়া তিনি বিজ্ঞানীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিলেন। সারা পৃথিবী তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল।

তিনিই আমাদের জগদীশচন্দ্র বসু।

বাংলা স্কুল ছাড়িয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজী স্কুলে ভরতি হন। তারপর ডাক্তারি পড়িবার জন্য তিনি বিলাত যান।
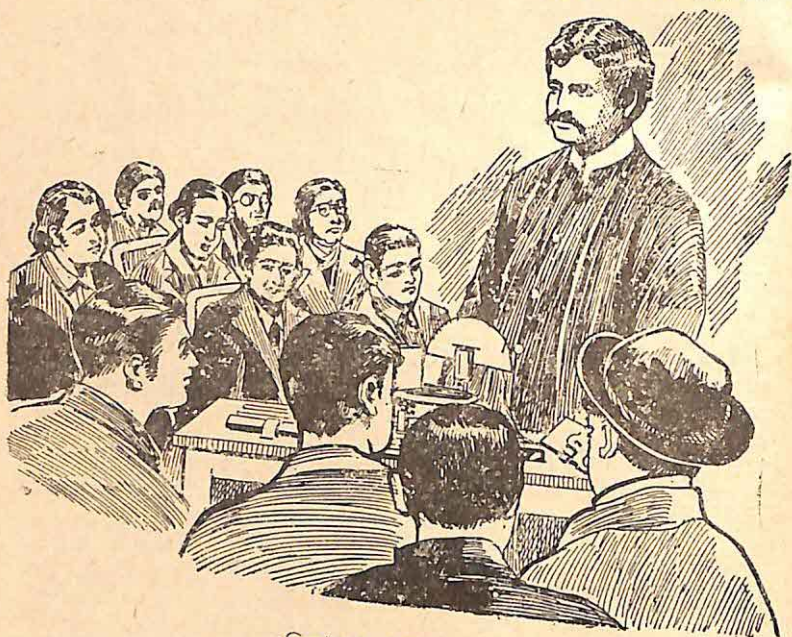
বিলাতের সভায় বক্তৃতা

ডাক্তারি পড়া খুবই পরিশ্রমের কাজ। সেই সময় তাঁহার প্রায়ই জ্বর হইত। ডাক্তারি পড়ার পরিশ্রম তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন ডাক্তারি ছাড়িয়া তিনি বিজ্ঞানের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এই বিজ্ঞানই তাঁহাকে যশের উচ্চশিখরে পৌঁছাইয়া দেয়।

আজ তোমরা ঘরে বসিয়া বেতারে গান শুনিতে পাও। বেতার আবিষ্কারের মূল সূত্র জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই সূত্র ধরিয়া মার্কোনি বেতার আবিষ্কার করিয়াছেন।

জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কারের দ্বারা বহু অর্থ উপার্জন
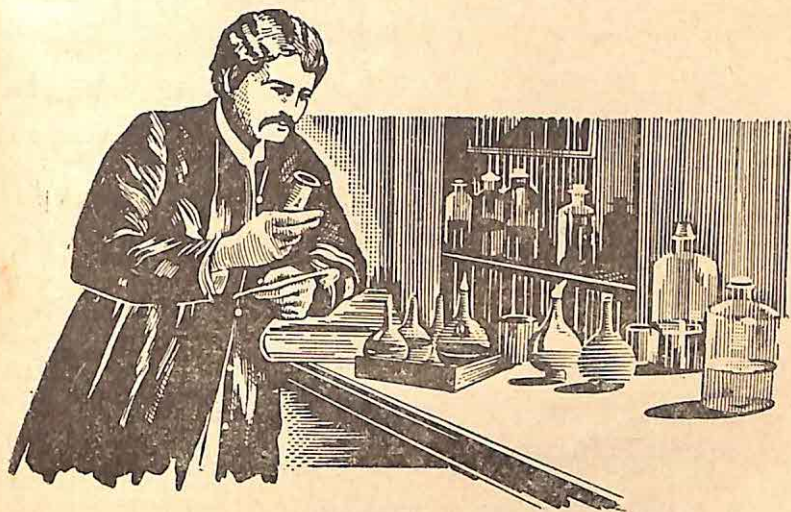
বিজ্ঞানের আরাধনা

করিয়া খুবই বিলাসে দিন কাটাইতে পারিতেন। কিন্তু যাঁহাদের মন উদার তাঁহারা নিজের সুখের জন্য ব্যস্ত হন না। জগদীশচন্দ্র ছিলেন জ্ঞানের পূজারী। তিনি তাঁহার আবিষ্কারগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি না করিয়া জগৎকে দান করিয়া গিয়াছেন। জগৎ তাঁহাকে অপার্থিব মহিমায় ভূষিত করিয়াছে।

ভারতের রাষ্ট্রগুরু

একজন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করিবে, ইহা ইংরেজেরা সহ্য করিতে পারিল না। নানা ছুতায় তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন বাধাই টিকিল না। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসিলেন।

ইংরেজের আমলে বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিস পাস করিতে হইত। যে ভারতীয় সেখানে গিয়া ভালভাবে সিভিল সার্ভিস পাস করিলেন, তিনি আমাদের সুরেন্দ্রনাথ।

পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশকে দুই ভাগ করিয়া বাঙ্গালীদের দুর্বল করিবার জন্য লর্ড কার্জন এক চাল চালিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহাকে বেচাল করিয়া বাঙ্গালীকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন কলিকাতা শহরে। তিনি অতি মেধাবী ও তেজস্বী ছিলেন।

তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পাওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় ইংরেজেরা তাঁহাকে অবজ্ঞার চোখে দেখিত। তাহারা সর্বদা তাঁহার দোষ খুঁজিয়া বেড়াইত।

ফলে, তাঁহার সহিত অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীর মনোমালিন্য হয় এবং তাঁহাকে চাকুরি ছাড়িতে হয়।

চাকুরি ছাড়িয়া তিনি বুঝিলেন, দেশ যতদিন পরাধীন থাকিবে ততদিন দেশবাসীর উন্নতির আশা নাই। বিদেশী ইংরেজের কাছ হইতে অবজ্ঞা ও অপমান সহ্য করিতে হইবে।

সেইজন্য দেশকে স্বাধীন করিয়া তুলিবার জন্য মুক্ত কণ্ঠে তিনিই প্রথম বলিয়া উঠেন,—স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার।

স্বাধীনতা আন্দোলন চালাইবার জন্য তিনি ও আর কয়েকজন মনীষী এক সংঘ গড়েন। তাঁহার নাম কংগ্রেস। তিনি পরে তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

যে উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কংগ্রেস সৃষ্টি করিয়াছিলেন সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে।

তাই সকলে বলে, সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রগুরু।

● অমরবাণী

রাজনৈতিক কাজের কিছু-কিছু প্রয়োজনীয়তা
আছে বটে, কিন্তু শিক্ষা-কার্যের প্রয়োজনীয়তা
সবচেয়ে বেশী চিরন্তন।

—রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

যুগাবতার

নাম তাঁহার গদাধর। তিনি বড় ভাইয়ের সঙ্গে কালীমন্দিরে আসিলেন। এইখানে গদাধরের মধ্যে ক্রমশঃ নানা পরিবর্তন দেখা দিতে লাগিল। লোকে তখনও তাঁহাকে পাগল বলিত। সত্যিই তখন তিনি ঈশ্বরকে পাইবার জন্য এত আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহার হাবভাব দেখিয়া সাধারণ লোক তাঁহাকে পাগল ছাড়া অন্য কিছু ভাবিতে পারিত না। পূজা করিতে করিতে অন্য মনে ঠাকুরকে ফুল না দিয়া তিনি নিজের মাথায় ফুল দিতেন। ঠাকুরকে ভোগ দিতে দিতে নিজে অন্যমনে সেই ভোগ খাইতেন।

হুগলী জেলায় কামারপুকুর নামে এক গ্রাম আছে। একশত কুড়ি বৎসর পূর্বে সেখানে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তখন কি কেহ জানিত যে সেই অজ্ঞাত গ্রামের এই ছেলেটিকে একদিন সারা ভারত পূজা করিবে ?

ছেলেটির নাম গদাধর। ছেলেবেলা হইতে তাঁহার চাল-চলন দেখিয়া সকলে বলিত ছেলেটি বোধহয় পাগল। সে বড় হয়, কিন্তু লেখাপড়া করে না। তাঁহার একমাত্র ঝোঁক ছিল ঠাকুরপূজায়।

যখন তাঁহার বয়স প্রায় এগার, তখন ক্ষুদিরাম মারা যান।

সংসার অচল হইয়া পড়ে। তাঁর বড় ভাই কলিকাতায় আসিয়া টোল খুলিয়া বসিলেন। গদাধরও তাঁহার সঙ্গে আসিল। কিন্তু পয়সা রোজগারের দিকে গদাধরের কোন ঝোঁক ছিল না।

এই সময়ে রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের সঙ্গে

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ

বারটি শিব মন্দির নির্মাণ করিলেন এবং গদাধরের দাদা রামকুমারের উপর পূজার ভার দিলেন। গদাধরও তাঁহার বড় ভাইয়ের সঙ্গে এখানে আসিলেন।

এই গদাধরই আমাদের রামকৃষ্ণ। রাণী রাসমণি গদাধরের

সব কাণ্ডকারখানা দেখিতে পান। সেই সঙ্গে গদাধরের জায়গায় দুটি আকৃতি পর পর তাঁহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। একটি সেই দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ, আর একটি তাহারও আগের যুগের শ্রীরামচন্দ্র। তারপর হইতে গদাধর হইলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—একই দেহে রাম ও কৃষ্ণের মিলিত প্রকাশ।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। নানা স্থান হইতে নানা লোক আসে। ঠাকুর সত্যই সিদ্ধ, না ভণ্ড তাহার পরীক্ষা চলে।

ঠাকুর সমাধিতে বসিলে তাঁহার দেহে অর্থ স্পর্শ করা হইলে, তাঁহার শরীরে অস্বস্তি হইত। অনেকে তাঁহার বিছানার তলায় টাকা রাখিয়া পরীক্ষা করিতেন। দেখা যাইত, তিনি সত্য ও খাঁটি। তখন বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়।

তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছেন। পৃথিবীর সব দেশে তাঁহার শিষ্যেরা লোকের সেবা করিতেছেন।

সারা পৃথিবীর লোকে তাঁহার নামে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

● মণিমুক্তা

ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে কিন্তু আকাশের কিছু করতে পারে না। বালক হচ্ছে সেই নীল আকাশের টুকরো।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
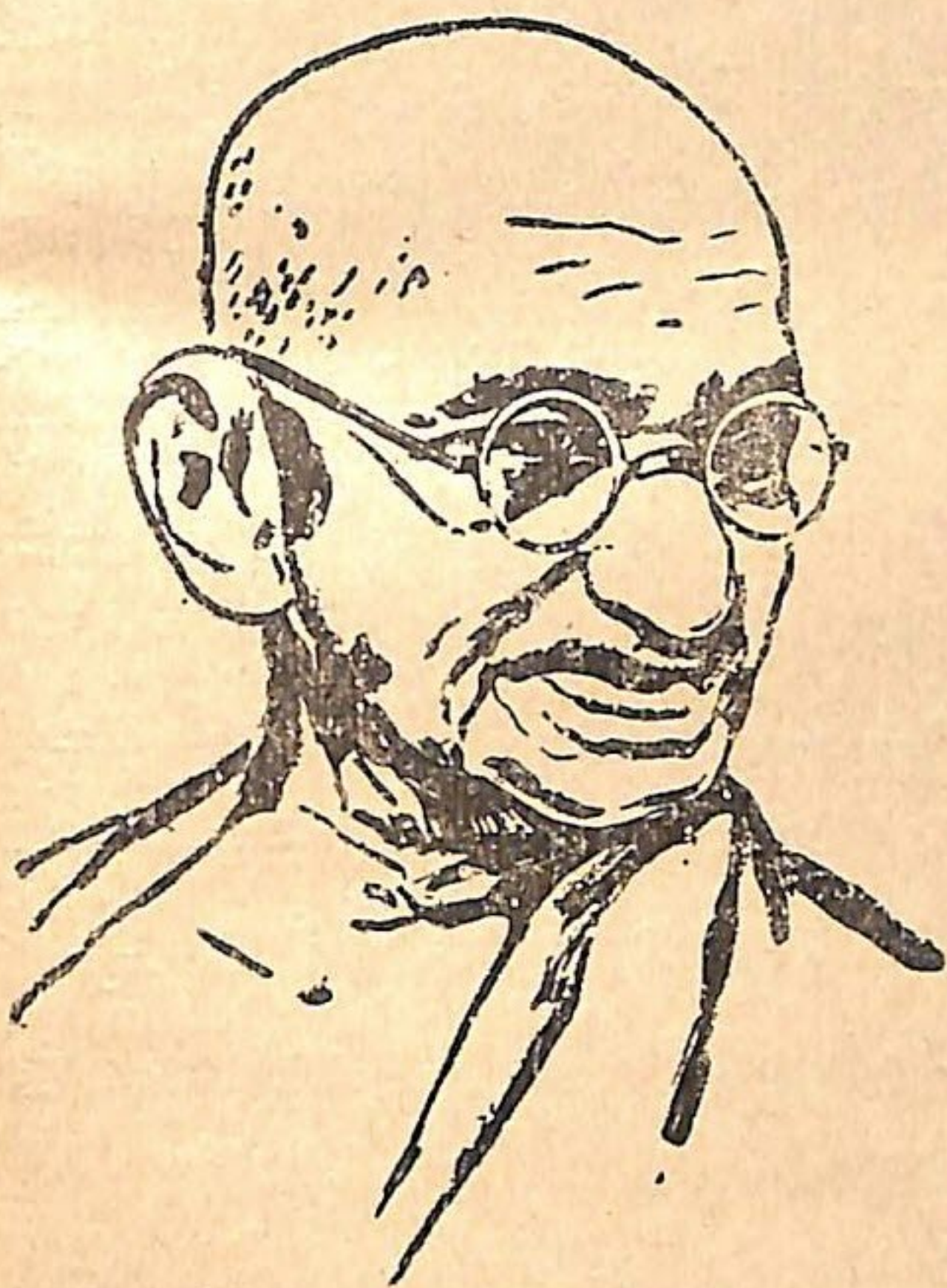
মহাত্মা

স্কুলে ছেলেদের মধ্যে বেশ একটা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। স্কুল বসিবার অনেক আগেই ছেলেরা সব আসিয়া জুটিয়াছে। শিক্ষকদের মধ্যেও যেন একটা ত্রস্ত ভাব! একজন সাহেব ইন্‌স্পেক্টর আজ স্কুল পরিদর্শনে আসিবেন, তাই সবার এত ব্যস্ততা।

ঘণ্টা পড়ে—কিছুক্ষণের মধ্যে ইন্‌স্পেক্টরও আসিয়া পড়েন। এঁর নাম জাইল্‌স্। প্রথমে তিনি গিয়া হাজির হন একটি ক্লাসে। ছেলেদের তিনি ৫।৬টি ইংরেজী শব্দের বানান লিখতে দেন। সেই শব্দ কয়টির একটি শব্দ—"Kettle"।

ক্লাসের পিছনের বেঞ্চে ছিল একটি অতি লাজুক ও ভীতু

প্রকৃতির ছেলে। ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি বানান লিখতে গিয়া সে Kettle শব্দটির বানানটিকে ভুল লেখে। শিক্ষক কাছেই দাঁড়াইয়া ছিলেন ; ছেলেটিকে ভুল বানান লিখিতে দেখিয়া সামনের ছেলের লেখা বানান দেখিয়া নিজেরটা সংশোধন করিয়া লইতে ইশারা করেন। কিন্তু সে তাহা করিল না। সব ছেলেরই বানান শুদ্ধ হইল, কিন্তু তাহার একটি বানান ভুল হইল। এজন্য তাহার কোন দুঃখ হইল না। ছেলেবেলা হইতেই সে এমনি ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ ছিল !

কিছুদিন পর ছেলেটি একখানি বই পড়ে। উহাতে ছিল শ্রবণের পিতৃভক্তির গল্প। কেমন করিয়া শ্রবণ নিজের অক্ষম পিতামাতাকে বহুকষ্টে কাঁধে বহন করিয়া দিনের পর দিন তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন তাহা পড়িয়া ছেলেটি একেবারে মুগ্ধ হয়।

এই সময় সেখানে এক নাটক-সম্প্রদায় আসে। সেই সম্প্রদায় কর্তৃক "হরিশ্চন্দ্র" অভিনয় দেখিয়া ছেলেটি ভাবিতে আরম্ভ করে,—লোকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত কেন সত্যপালন করে না ? সত্য রক্ষার জন্য হরিশ্চন্দ্র কি না করেছিলেন ? নিজের স্ত্রী, পুত্র, এমন কি, নিজেকে পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন।

উপরের ঘটনা দুইটি ছেলেটির মনে গভীর রেখাপাত করে ও তাঁহার জীবনের আদর্শ হইয়া উঠে। তাই তিনি জীবনে যাহা

সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা বলিতে বা করিতে কোনদিনই ভয় করিতেন না। এই সত্য রক্ষার্থেই তিনি বার বার কারাবরণ করেন, সরকারের হাতে বহু লাঞ্ছনাও ভোগ করেন। কিন্তু এজন্য তিনি কোনদিনই কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নীতির নাম "সত্যাগ্রহ"।

সেদিনের সেই সত্যনিষ্ঠ, পিতৃভক্ত ছেলেটি কে, জান? তিনি জাতির জনক "মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী"।

● **অমরবাণী**

আমাদের সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রতিপক্ষের একবিন্দু রক্তেও যেন আমাদের হাত কলুষিত না হয়, কখনও যেন আমরা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করি।

যাঁহারা হিন্দুধর্মের মর্ম বুঝেন, তাঁহাদের কর্তব্য, অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য ভাই-ভগিনীকে আপনার করিয়া লওয়া, তাহাদিগকে আদর ও সেবার উদ্দেশ্যে স্পর্শ করা এবং স্পর্শ করিয়া নিজে পবিত্র হইলাম, এইরূপ মনে করা।

● **'আমার জীবনই আমার বাণী'**

—মহাত্মা গান্ধী
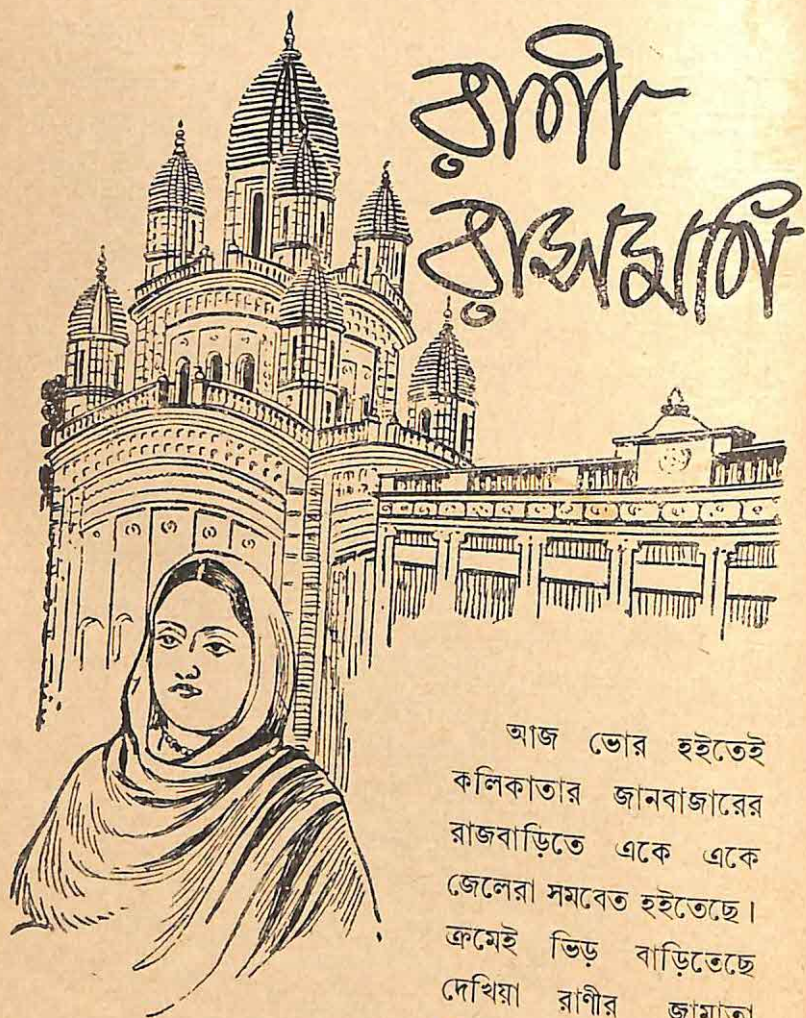
রাণী রাসমণি

আজ ভোর হইতেই কলিকাতার জানবাজারের রাজবাড়িতে একে একে জেলেরা সমবেত হইতেছে। ক্রমেই ভিড় বাড়িতেছে দেখিয়া রাণীর জামাতা মথুরবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। অনুসন্ধানে তিনি জানিতে পারিলেন যে, জেলেরা

রাণীমার সহিত দেখা করিতে চায়। রাণী রাসমণিকে তখনই তিনি খবর পাঠাইলেন। জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে সকলের সম্মুখে রাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণীকে দেখিয়া একজন মাতব্বর ধরনের জেলে আগাইয়া আসিয়া রাণীকে প্রণাম করিয়া বলিল— "মা! আজ আমাদের বড় বিপদ! সাত পুরুষ ধরে আমরা মাছ ধরে খাই, কিন্তু গবর্নমেণ্টোকে কোনদিনই টেস্‌কো দিই নি। আজ সাহেবরা আমাদের কাছে টেস্‌কো চায়। আমরা কোত্থেকে তা দেব মা? টেস্‌কো দিতে গেলে যে, আমরা না খেয়ে মরব! এ বিপদ থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও!" বলিতে বলিতে লোকটির দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল। স্থির হইয়া রাণী তাহার সকল কথা শুনিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন —"এখন তোমরা যাও। দেখি, আমি কতদূর কি করিতে পারি!" জেলেরা 'জয় রাণীমার জয়' 'জয় রাণী রাসমণির জয়' বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

রাণী বাড়ির ভিতর আসিয়া জামাতা মথুরবাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মথুরবাবু আসিলে রাণী আদেশের স্বরে বলিলেন— "সাহেব বেনেরা এবার বোধ হয় গঙ্গা জমা দেবে। যেমন করে হোক এবার আমাদের গঙ্গা জমা নিতেই হবে। এর জন্য যত টাকাই খরচ হয় হোক, পিছপা হয়ো না বাবা! এখনি তুমি বেরিয়ে যাও।" প্রচুর টাকা দিয়া মথুরবাবু রাণীমার নামে গঙ্গা জমা লইলেন। খবরটি শুনিয়া রাণী একটু হাসিলেন। পরে

মথুরবাবুকে আদেশ করিলেন—গঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা ভাল করিয়া লোহার শিকল দিয়া ঘিরিয়া দিতে। দরিদ্র জেলেরা সীমানার মধ্যে থাকিয়া পরমানন্দে মাছ ধরিতে লাগিল। এদিকে ইংরেজরা মহা মুশকিলে পড়িল। আজকালকার মতন রেল বা এরোপ্লেন তখন ছিল না। তখনকার দিনে মালপত্র তাই জল-পথেই বেশির ভাগ আমদানী রপ্তানী হইত। মাল-বোঝাই বা লোক-বোঝাই বহু জাহাজ কলিকাতার বন্দরে প্রবেশ করিতে যাইয়া ইহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইল। রাণীর লোকলশকরেরা তাঁর সীমানার মধ্যে কোনমতেই জাহাজ প্রবেশ করিতে দিল না। ইংরেজ সরকারের কাছে এই খবর পৌঁছিল। সরকার দেখিলেন যে, তাঁহারা নিজেদের জালে নিজেরাই আবদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা বাধ্য হইয়াই ইহার প্রতিকারের জন্য রাণীর দ্বারস্থ হইলেন। ভবিষ্যতে জেলেদের আর কোনদিন ট্যাক্স ধার্য করা হইবে না—এই শর্তে আপস হইল। রাণীও গঙ্গার শিকল খুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

আর একবার একদল গোরা সৈন্য রাত্রে মদ খাইয়া আসিয়া রাণী রাসমণির বাড়িতে লুটতরাজের উদ্দেশ্যে ঢুকিয়া পড়ে। লেঠেল এবং চাকর দ্বারোয়ানদের ঘায়েল করিয়া তাহারা অন্দরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অন্দরের সম্মুখে আসিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া যায়! সেখানে খাঁড়া হাতে করিয়া রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন স্বয়ং রাণী রাসমণি! রাণীর

সেই ভয়ংকরী মূর্তি দেখিয়া সেদিন বিদেশীয়দের মনেও ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল। সেদিন তাহারা মাথা নীচু করিয়াই রাজবাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত কালীমন্দির এবং অতিথিশালা রাণী রাসমণিরই অতুল কীর্তি!

সাধক নাট্যকার

বাজারের থলেটি হাতে লইয়া বাজারে চলিয়াছেন নাট্যকার —গিরিশচন্দ্র। বলরামবাবুর বাড়ির সামনে ভিড় দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "এখানে আজ কি?" উত্তরে—যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রূ দুইটা কুঁচকিয়া উঠে। নিজের মনে তিনি বলিতে থাকেন—"কে না কে এক সাধু আসবেন, তাঁর জন্যে আবার এত ভিড়! কাজ নেই, কর্ম নেই যত সব—।" কথাটা বলিতে বলিতে তিনি সেখান হইতে নিজের কাজে চলিয়া যান।

ফেরার পথে—ঠিক সেই জায়গায় গিরিশবাবুকে আবার দাঁড়াইতে হয়। একজন সাধু গোছের লোক গাড়ি হইতে নামিতেছেন। কেমন যেন আকর্ষণ জাগে গিরিশবাবুর মনে!

তাড়াতাড়ি বাজারের থলিটা বাড়িতে রাখিয়া আসিয়া গিরিশবাবু সোজা গিয়া উঠেন বলরামবাবুর বসিবার ঘরে। সাধুটি তখন নিজের মনেই ভক্তদের উপদেশ দিয়া চলিয়াছেন। গিরিশবাবু তন্ময় হইয়া সেই উপদেশবাণী শুনিতে থাকেন।

ঘর হইতে যখন বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মন আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। বার বার সাধুটিকে দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। এক একবার ভাবেন যে, লোকটা কোনরকম বশীকরণ করে নাই তো? কে জানে? আর না গেলেই হবে।

কয়েকদিন পর, গিরিশবাবু খবর পাইলেন যে বলরাম-বাবুর বাড়িতে আবার সেই সাধুটি আসিবেন। এবারে তিনি আগেই গিয়া বলরামবাবুর বৈঠকখানায় নিজের জায়গা করিয়া লইলেন। সেদিন উপদেশ দিতে দিতে সাধুটি বার বার গিরিশবাবুর মুখের দিকে চান। সাধুটির সম্বন্ধে অবিশ্বাসের লেশমাত্র আর থাকে না গিরিশবাবুর মনে। সকলে উঠিয়া গেলে তিনি লুটাইয়া পড়েন সেই সাধুর পায়। বলেন, "তুমি আমাকে উদ্ধার কর। আমি ভগবানকে জানি না, বা মাকেও জানি না। আমি জেনেছি শুধু তোমাকে। তুমি আমাকে আশ্রয় দাও! আমাদের মত পাপীতাপীকে উদ্ধার করতেই তুমি জন্মগ্রহণ করেছ মানবদেহে! তুমি কি সামান্য? তুমি যে যুগাবতার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'!"

সাত বছর বয়স হইতেই ছেলেটি বিলাতে লালিত-পালিত। বাঙ্গালীর ছেলে হইয়াও বাংলা ভাল জানিত না। বিলাতে কিন্তু সে ছিল মেধাবী ছাত্র। তাহার প্রতিভা দেখিয়া শিক্ষকেরা অবাক্ হইয়া যাইতেন। আই. সি. এস. পরীক্ষায় সে ভাল করিয়া পাস করিল, কিন্তু ঘোড়ায় চড়া না জানার জন্য তাহার আই. সি. এস. হওয়া হইল না।

বারাদার মহারাজা তখন ছিলেন বিলাতে। তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। ভারতে ফিরিয়া তিনি বরোদায় শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। বেদ ও উপনিষদ পড়িয়া তাঁহার সামনে এক নূতন আলো জ্বলিয়া উঠিল। বুঝিলেন ভারতের প্রাণ কোথায়। তার আত্মা কোন্‌খানে।

এই সময় হইতেই পরাধীন ভারতের দুঃখ তাঁহার মনে পীড়া দিতে লাগিল। তখন ১৯০৮ সাল। বাংলার দিকে দিকে

স্বদেশী আন্দোলনের বন্যা। চারিদিকে সভা-সমিতি। শ্রীঅরবিন্দ বরোদার চাকুরি ছাড়িয়া সোজা বাংলায় চলিয়া আসিলেন। বাহির করিলেন 'বন্দে মাতরম্' নামক ইংরেজী পত্রিকা। কি তাঁহার পাণ্ডিত্য! কি দেশভক্তি! কি লিখিবার ভঙ্গী! সারা দেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভারতে এই সময় একটি বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের চোখে ছিল এদেশকে স্বাধীন করিবার স্বপ্ন—মনে ছিল তেজ। তাঁহারা ইংরেজ সরকারের বিষ নজরে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত শ্রীঅরবিন্দও গ্রেপ্তার হইলেন।

শ্রীঅরবিন্দের বিচার হইল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার সমর্থন করিলেন। বিচারে তিনি মুক্তি পাইলেন।

জেল হইতে বাহির হইয়াই তিনি পণ্ডিচেরীতে নির্জন তপস্যায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাল তিনি এখানে সাধনা করিয়া কাটাইলেন মানুষের কল্যাণের জন্য। বিশ্বের মানুষের সম্মুখে তিনি দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তির মন্ত্র বলিয়া গেলেন।

কত বই যে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, কত কাজের কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে শ্রদ্ধা জানাইয়া বলিয়াছেন, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'।

শ্রীঅরবিন্দ আজ নাই, কিন্তু তাঁহার অমর বাণী সারা বিশ্বে ছড়াইয়া আছে।

———

দেশের সেবক

উনিশ শো বাইশ সাল। ভীষণ বন্যায় উত্তর বঙ্গ ভাসিয়া গেল। লোকে সর্বস্বান্ত হইয়া গেল। কত লোক মরিয়া গেল, কত গরু-বাছুর ভাসিয়া গেল।

একজন শীর্ণকায় পুরুষ অতি সাদাসিধে পোশাকে দিনরাত লোকের সেবা করিয়া চলিলেন। যাহাদের অসুখ করিয়াছে তাহাদের ঔষধ দিয়া, যাহারা খাইতে পাইতেছে না তাহাদের খাদ্য দিয়া ইনি অক্লান্ত সেবা করিতেছেন।

দুর্গম পথের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। কে এই পুরুষটি ?—এঁর নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, সারা পৃথিবী জোড়া এঁর নাম।

এত বড় একজন লোক, কিন্তু পরিধানে শুধু খদ্দরের জামা ও খদ্দরের কাপড়। অতি সাধারণভাবে থাকেন। নিজের জন্য মাত্র চল্লিশ টাকা খরচ করেন, অথচ মাসিক আয় সহস্রাধিক টাকা। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে সারা জীবন তিনি যা উপার্জন করিয়াছেন, তার

সব কিছুই তিনি এদেশের বৈজ্ঞানিক উন্নতির জন্য বিলাইয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালীর ছেলেকে তিনি সব সময় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কার্য
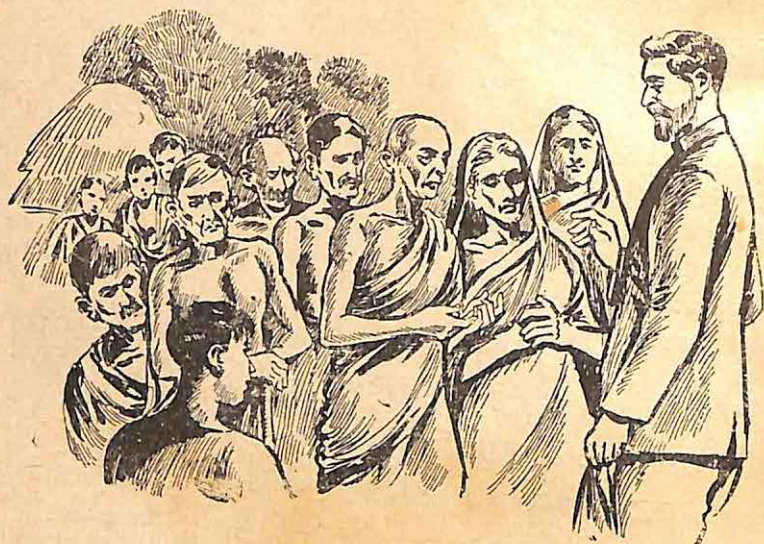
সেবা-কার্যে প্রফুল্লচন্দ্র

ইত্যাদিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালীকে ইনি প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসিতেন।

এমন একজন সরল জ্ঞান-তপস্বীকে আমরা পাইয়াছিলাম আমাদের মধ্যে, একথা ভাবিতেও গর্বে আমাদের বুক ভরিয়া ওঠে।